

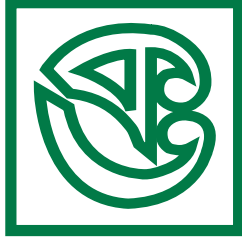
ক বড় মান জুড়ে রয়েছে।
 নীবন। একমাত্র বুদ্ধের শিক্ষায় মানুষ
 হয়েই দেখা দিয়েছে। যে মানুষ সমাজ, রাষ্ট্র আর
 সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। অমৌকিকতা
 নে হালে দানি পায় না। তাই যোগ্য করে বুদ্ধের শিক্ষা
 বেদনে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
 : বুদ্ধ যমই একমাত্র যম যা মানুষের তৈরী আর
 তাভাবে তা মানুষের জন্যেই এবং মানুষকে নিয়েই।
 ক দিয়ে একে মানবযমই বলা যায় আর এ যমের
 ককে মতগ্যথেই বলা যায় মহামানব। মহামানব বুদ্ধের
 যম হোক। জয় হোক তাঁর অহিংসা মন্ত্রের আর
 নীবন-চেতানার।

মানবত্ব-বুদ্ধ

আবুন ফাজল

কথাটা খুবই মূল্যবান। ক্ষিরবুদ্ধি
 না অপরাধ বা অশ্রুতে ঘটেছে পারেনা-পারে
 বা অপরাধের দুঃখের কারণ হতে। বুদ্ধ-বিশ্বহ, দাক্ষা-হাস্যামা, অনাচার, অসমতা
 সমাজেদেরই কাণ্ড। ইচ্ছিমদমন ও স্বার্থত্যাগ এ দুই প্রাথমিক শর্ত পালন করে
 দি হতে পারে।
 আর মানবতায় বিশ্বাসী ছিলেন-তাই এমন কোন আদেশ নিষেধ তিনি প্রচার করেন
 মানুষের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্ধ আনুগত্যের তিনি বিরোধী।
 বীনতার মূল্য তিনি বুঝতেন ও দিতেন তার স্বীকৃতি।
 মানব অবরকম অংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তাই মানুষের প্রতি তাঁর উদাত্ত
 -দূর কর পুরনো অংস্কারকে, বরং করে নাত্ত নতুনকে, পরিহার করো দাপ,
 করো অক্ষয়। অবরকম দাপ আর বামনা কামনার বিরুদ্ধে করো বীরবিক্রম
 বুদ্ধ অ-বুদ্ধ সকলের দৃষ্টি এ মহৎ বাণীর প্রতি আবার নতুন করে
 হোক।

জিজ্ঞাসা
 তা অবই চেবো, জিজ্ঞাসা
 দ্বারা এসবের কিছুই হয়



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।

ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান

বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের

কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা

সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায়

ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante



মানবপুত্র-বুদ্ধ আবুল ফজল

লেখাক্রম :

- ১ মানবপুত্র-বুদ্ধ
- ৫ বৌদ্ধ ধর্ম ও বিশ্বশান্তি
- ৯ বুদ্ধের জীবনদর্শন
- ১৪ মহানারদ বুদ্ধ
- ১৬ বুদ্ধ : এক আলোকবর্তিকা

সিরিজ পুস্তিকা - ৯

সোসাইটি পুস্তিকা-৬

প্রথম প্রকাশ

পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

মধু পূর্ণিমা, ১৯ ভাদ্র, ১৩৮৬ সাল

দ্বিতীয় প্রকাশ :

© বুডি-স্ট রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার, বাংলাদেশ।

২৩ জুন ২০০৩

আর্থিক সহায়তা

প্রিয়দর্শী বড়ুয়া

সুদীপ্তিময়ী বড়ুয়া

প্রচ্ছদ শিল্পী

আবুল মনসুর

কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি :

বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

প্রকৌশলী মৃগাংক প্রসাদ বড়ুয়া

বিনোদ কান্তি বড়ুয়া

অধ্যাপিকা সুপ্রিয়া বড়ুয়া

মিটন কান্তি বড়ুয়া

প্রাপ্তিস্থান

নালন্দা লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য

পঁচিশ (২৫) টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ

ও মুদ্রণ

ওসাকা আর্ট প্রেস

৭, মোমিন রোড, আন্দরকিল্লা

চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩১০৮৯

নিবেদন

“মানবপুত্র বুদ্ধ” বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত আমার কয়েকটি ছোট ছোট লেখার সংকলন। এ লেখাগুলিতে বুদ্ধের মহাজীবনের প্রতি যথাযোগ্য কিছু করা হয়েছে এমন দাবী লেখকের নেই। এ শুধু মহামানব বুদ্ধের প্রতি এক অ-বৌদ্ধ ভক্তের সামান্য শ্রদ্ধা নিবেদন।

শ্রদ্ধার কোন দেশ, কাল, জাত ধর্মবর্ণ কুল নেই—যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ সেখানে শ্রদ্ধা আপনা থেকে আত্মনিবেদন না করে পারেনা। বুদ্ধের মধ্যে মনুষ্যত্বের এক অসাধারণ বিকাশ এ লেখক লক্ষ্য করেছে যা কোন অর্থেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না—ছিল সর্বমানবিক এবং সর্বতোভাবে বৈশ্বিক।

বর্তমান পরিবেশে বুদ্ধের মতো মানবতাবাদী মানবহিতৈষী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়তো কল্পনা করা যায় না। অহিংসা, করুণা, সর্বজীবে দয়া এসব বুদ্ধবাণী আজ হয়তো পরিহাসের মতো শোনাবে। তবুও আমার বিশ্বাস প্রতি মানুষ জন্মসূত্রেই একটা মানবিক চেতনা নিয়ে জন্মায়—প্রতিকূল পরিবেশে তা হয়তো বিকাশের সুযোগ পায় না। কিন্তু মানবপ্রকৃতির সঙ্গে যা অবিচ্ছেদ্য তা কখনো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে মরে যায় না। তার সামনে মানবিকতার তথা মনুষ্যত্বের আলোকবর্তিকা তুলে ধরতে হয় সবসময় যা তাকে দেখাবে পথ, করবে চলার পথে সহায়তা।

মানবপুত্র বুদ্ধ বিশ্বের সামনে তেমন এক অনির্বাণ আলোক-বর্তিকা। এ বই তার থেকে ধার করা কিছু আলোর কণিকা।

এই ক্ষুদ্র বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ। এর বিক্রয়লব্ধ অর্থও ঐ সোসাইটিরই লভ্য।

আবুল ফজল

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

এক. প্রকাশনা প্রসঙ্গ :

অবুল ফজল রচিত প্রবন্ধসংগ্রহ ‘মানবপুত্র বুদ্ধ’ সংকটদীর্ণ আধুনিক পৃথিবীর চিন্তাজগতে যৌক্তিক কারণে বিশেষভাবে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছে। ‘মহামানব বুদ্ধের প্রতি এক অ-বৌদ্ধ ভক্তের সামান্য শ্রদ্ধা নিবেদন’ হিসেবে এ লেখা কয়টি সম্পর্কে মুক্তবুদ্ধির অগ্রণী সৈনিকরূপে সুখ্যাত আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন : ‘বুদ্ধের মধ্যে মনুষ্যত্বের এক অসাধারণ বিকাশ এ লেখক লক্ষ্য করেছে যা কোন অর্থেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিলনা—ছিল সর্বমানবিক এবং সর্বতোভাবে বৈশ্বিক।’

‘মানবপুত্র বুদ্ধ’ আখ্যায়িত করার মধ্যেই ভ্রান্ত ধারণায় অবলুপ্ত এক মহামানবের অনন্য মহিমাকে অত্যাঙ্কুল করে তোলার প্রয়াস লক্ষণীয় এবং ‘মানবপুত্র’ আখ্যাটি প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়াও বটে।

যদিও সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখা ব্যাপ্তি ও গভীরতায় পাঁচটি প্রবন্ধই বিশেষভাবে ঋদ্ধ এবং বক্তব্যে বুদ্ধ বাণীর নিত্যপ্রাসঙ্গিকতার দীপ্তি সমুজ্জ্বল হয়ে আছে বিধায় প্রথমেই ‘মানবপুত্র বুদ্ধ’ পুস্তিকাটি ‘সোসাইটি পুস্তিকা’-৬ এবং বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার, বাংলাদেশ, সিরিজ পুস্তিকা — ৯ রূপে প্রকাশিত হলো।

উল্লেখ্য : দূরদর্শী চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনসায়াছে শ্রী বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া পালি বুক সোসাইটির যাবতীয় পুস্তকাদির স্বত্ব সম্প্রতি আমাদেরকে প্রদান করেছেন। সোসাইটি প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে ‘মানবপুত্র বুদ্ধ’ বইটির প্রকাশ শুধু এর মূল্য বিবেচনায় নয়, আবুল ফজলের জন্মশতবর্ষে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-নিবেদনের

স্মারকরূপেও বটে। এ স্মারকের অংশরূপে মানবতার প্রমূর্ত প্রতীক মুক্ত চিন্তাবিদ আবুল ফজলের সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য ও স্বতন্ত্রভাবে সংযোজিত হলো।

দুই. প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা :

বইটির মূল প্রচ্ছদ ভেতরে রেখে ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অবিকল রেখে দিয়ে নতুন অঙ্গসজ্জায় ও প্রচ্ছদে 'মানবপুত্র বুদ্ধ' বের করা হলো।

তিন. অর্থায়নের জন্য কৃতজ্ঞতা-স্বীকৃতি :

আমাদের এক শুভানুধ্যায়ী লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী শ্রী দীপক বড়ুয়া এবং এমিলি বড়ুয়া তাদের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র পনের বছর বয়সী ছেলে দীপায়ন বড়ুয়া বুবাইকে গত ২০০১ সালের ২৩শে জুন হারিয়ে শোকবিধুর হয়ে উঠেছিলেন। সে বেদনার ভার লাঘবের জন্য তারা সুপণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারীকৃত পাঠকসমাদৃত পুস্তক 'মহাশান্তি মহাপ্রেম' বাংলাদেশে পুনর্মুদ্রণের জন্য সকল ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। অকালপ্রয়াত ছেলের-সংক্ষিপ্ত জীবনকথাসহ বইটি তার স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

এবার দীপায়ন বড়ুয়া বুবাই-এর পারলৌকিক মঙ্গলার্থে দ্বিতীয় মৃত্যু বর্ষে এগিয়ে এসেছেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী (বড়ুয়া বেকারী) ঠাকুরদা প্রিয়দর্শী বড়ুয়া এবং ঠাকুরমা সুদীপ্তিময়ী বড়ুয়া 'মানবপুত্র বুদ্ধ' পুনর্মুদ্রণের জন্য সার্বিক আর্থিক আনুকূল্য নিয়ে। তাদের বেদনাভরাতুর হৃদয়-ক্ষতের উপশম হোক-এটাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

সভাপতি

অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া

সম্পাদক

বুডি-স্ট রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার, বাংলাদেশ।



পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ

স্থাপিত : ১৯৭৮

১২, হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম।

PALI BOOK SOCIETY, BANGLADESH

12, HEMSEN LANE, CHITTAGONG.

সূত্র :

অমঃ বুদ্ধান

তারিখ : ২৪.১১.২০১৩

আমি এতদ্বারা পালি বুক সোসাইটি, প্রকাশিত পুস্তকাদির
মূল: প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ, সংরক্ষণ, প্রচারিত ইত্যাদি
স্বত্বীয় ক্ষেত্র বৃত্তি-ই বিচারে বঙ্গ আচার্যবরগণের অন্তর্ভুক্ত
বঙ্গোপদেষ্টার এবং বঙ্গোপদেষ্টার প্রতি অঙ্গন-সম্মিলন।

স্বত্বীয় অধিকার কার্যকর-আমি প্রকাশিত পুস্তকাদির
পালি বুক সোসাইটি, বঙ্গোপদেষ্টা-এর কার্যকর-সম্মিলন
কার্যকর-মিত্র অঙ্গন ইত্যাদি স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
স্বত্বীয় ইত্যাদি এবং অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন না। তবে
আমি প্রকাশিত-প্রকাশিত প্রতিষ্ঠিত পালি বুক সোসাইটি-এর
অঙ্গন-সম্মিলন স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন
বৃত্তি-ই অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন
অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন
বঙ্গোপদেষ্টার বঙ্গোপদেষ্টার অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন
অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন

স্বত্বীয় : ১। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
২। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
৩। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
৪। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
৫। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
৬। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
৭। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
৮। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
৯। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন
১০। স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন

স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন
স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন
স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন

স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন
স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন
স্বত্বীয় অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন অঙ্গন-সম্মিলন

উৎসর্গ

যে ফুল না ফুটিতে
ঝরিল ধরণীতে
জানি হে জানি
তাও হয়নি হারা ।.....



দীপায়ন বড়ুয়া বুবাই-এর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে-

প্রিয়দর্শী বড়ুয়া (ঠাকুরদা)
সুদীপ্তিময়ী বড়ুয়া (ঠাকুরমা)

প্রসঙ্গ কথা

পালি বুক সোসাইটির প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে একদিন শিক্ষিকা চারুবালা বড়ুয়াসহ জনাব আবুল ফজল সাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম। আলোচনার মাধ্যমে তিনি পালি বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মহতী উদ্দেশ্যের কথা অবগত হন এবং সোসাইটির বিগত এক বছরের কার্যাবলীর খবর শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আর ঠিক সে সময়েই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের দায়িত্ব আমাদের সোসাইটির হাতে অর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে প্রকাশিতবা গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব তিনি সোসাইটিকে দান করবেন এবং গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সোসাইটির মহতী কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যয়িত হবে। মহানুভব আবুল ফজল সাহেবের এ প্রস্তাব আমি সোসাইটির পক্ষে সানন্দে গ্রহণ করি এবং ঐ গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেই বহন করব বলে ব্যক্ত করি। মানবপুত্র বুদ্ধ সে প্রচেষ্টারই ফসল।

মানবপুত্র বুদ্ধ সকলের হাতে তুলে দিতে পেরে সীমাহীন আনন্দ অনুভব করছি। মানবপ্রেমিক আবুল ফজল সাহেবের অভিজ্ঞতার আলোকে বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে এ গ্রন্থ বুদ্ধের মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও অহিংসার বাণী অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়েছে। আশা করি বর্তমান বিশ্বে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হবে। এর বহুল প্রচার কামনা করি।

সকলপ্রাণী সুখী হোক-

ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী

সভাপতি

পালি বুক সোসাইটি বাংলাদেশ।

শহীদ সুপতি রঞ্জন বড়ুয়া

একাত্তরের বর্বর পাকসেনাদের নরমেধ যজ্ঞের কথা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মন থেকে মুছে যাবেনা, তেমনি মুছে যাবেনা বাঙালী বৌদ্ধদের মন থেকে ঐ নরমেধ যজ্ঞের বলি সুপতি রঞ্জন বড়ুয়ার স্মৃতি।

সুপতি রঞ্জন বড়ুয়া একটি নাম। ১৯৩১ সনের ৩১শে অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাস্থ কেউটিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম বিভীষণ বড়ুয়া। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। ছাত্রজীবনে তিনি কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জীবনের সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আই. এ. পরীক্ষায় পঞ্চদশ স্থান অধিকার তাঁর মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। তিনি ১৯৫২ সনে অর্থনীতিতে অনার্সসহ এম. এ. পাশ করেন।

কর্মজীবনে সুপতি রঞ্জন বড়ুয়া প্রথমে কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় সুপরিষদের সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রেলওয়ে সার্ভিসে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রেলওয়ে বোর্ডের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পদে উন্নীত হন কিন্তু বর্বর হানাদার সেনার নির্মম আঘাতে সে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যু বৌদ্ধ সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। শহীদ সুপতি রঞ্জন বড়ুয়া বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আর সে সময়ই তিনি ত্রিপিটক পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক প্রচারের কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি। সুখের কথা বাংলাভাষায় ত্রিপিটক প্রচারের মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি গঠিত হয়েছে পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ। তাঁর অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে আমরা স্মরণ করি শহীদ সুপতি রঞ্জন বড়ুয়াকে।

পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

মানবপুত্র-বুদ্ধ

আড়াই হাজার বছর মানুষের ইতিহাসে বেশ সুদীর্ঘ কাল। এত সুদীর্ঘ যে তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলা চলে। বুদ্ধ এ প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ।

ধর্মের সঙ্গে যাদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব একাত্ম হয়ে গিয়েছে, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তুলনার লোভ এড়াতে পারেন না কেউই। অথচ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে—সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ ও ভিন্নতর ঐতিহাসিক প্রয়োজনে মহাপুরুষ তথা বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে থাকে। তুলনা যাঁরা করেন তাঁরা দেশ-কাল-পাত্রের এ দুষ্টর ব্যবধান প্রায় ভুলে যান! যে কোন ব্যক্তিত্বের মূল্য বিচারের জন্য নির্ভুল ঐতিহাসিক বোধের অভাব ঘটলে লেখা ও বলা আবেগসর্বশ্ব হতে বাধ্য। বুদ্ধি ও বিচারহীন অনিয়ন্ত্রিত আবেগ যুগে যুগে বহু অনর্থের কারণ হয়েছে।

বর্তমান যুগকে আমরা বৈজ্ঞানিক যুগ বলি। বিজ্ঞানকে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনে স্বীকার করে নিয়েছি। অথচ ভাব ও আবেগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে আমরা কোন আমলই দিই না। বিশেষতঃ ধর্ম সম্পর্কীয় ব্যাপারে আমরা দিবাক্ষ বুলেই চলে। অনেকেই হয়ে পড়ি আবেগের স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ড মাত্র।

গৌতম বুদ্ধ মানুষ ছিলেন। এ সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর ধরে তিনি বেঁচে আছেন মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মানসে নিছক মানুষ হিসেবে।

কারণ মানুষের অতিরিক্ত কোন দাবী তাঁর ছিল না। তিনি অবতার ছিলেন না, ঈশ্বরের পুত্রও না—নবী বা ঈশ্বরের বাণীবাহক বিশেষ দৃতও ছিলেন না। তাঁর সাফল্য ও সাধনার জন্য কোন অ-পৌরুষেয় শক্তির মুখাপেক্ষী তিনি হননি, নির্ভর করেননি কোন রকম অলৌকিকতার উপর। এখানেই তাঁর গৌরব—এখানেই এ মানব-পুত্রের মহিমা। এ দিক দিয়ে আধুনিক মানুষের কাছেও তিনি সর্বাধুনিকতার আদর্শ।

প্রাচীন মানুষ ও প্রাচীন সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ—রূপকের ব্যাপক ব্যবহার। জীবন ও জ্ঞানের যে-কোন গভীর তত্ত্ব ও তথ্য বুঝতে ও বোঝাতে তখনকার যুগে পদে পদে রূপকের আশ্রয় নেওয়া হত। তাই বাইবেল, কোরাণ, বেদ-বেদান্ত সর্বত্রই আমরা রূপকের ছড়াছড়ি দেখতে পাই। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং অধিকতর প্রাচীন বলে এসবে রূপকের ব্যবহার অত্যধিক লক্ষ্যগোচর। ধর্ম-প্রবর্তক ও ধর্মগ্রন্থ আলোচনার সময় এসব রূপককে রূপক হিসেবে না নিয়ে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে বিড়ম্বিত হতে হয়। এ বিড়ম্বনা আমাদের জীবনে বহু অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। এরই ফলে ধর্মের নামে ধর্মান্ধতা পেয়েছে ব্যাপক প্রশ্রয়—সব দেশে, সব যুগে ও সব সম্প্রদায়ে।

মহাপুরুষের প্রতি যত বেশী অলৌকিকতার আরোপ আমরা করব তত বেশী তিনি আমাদের পর হয়ে যাবেন। তাঁকে গ্রহণ না করার ফন্দি হিসেবে এটা মন্দ উপায় নয়, কিন্তু নিজেরা থেকে যাব বঞ্চিত। আলোর স্বরূপ বুঝতে হলে চন্দ্র-সূর্যের দিকে চোখ খুলে তাকাতে হয়। মহাপুরুষেরাও চন্দ্র-সূর্যের মত—তাঁদের বুঝতে হলে বুদ্ধির চোখ খোলা রাখতে হয়। ভাবাবেগে অভিভূত হলে মহাপুরুষদের

স্বরূপ উপলব্ধি ও সত্য পরিচয় লাভে বিঘ্ন ঘটে। একমাত্র মুক্তবুদ্ধি মানুষেরাই মহাপুরুষদের বুঝতে পারেন, গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরাই রূপককে পেরিয়ে পৌঁছতে পারেন রূপে, অলৌকিকতার আবরণ ভেদ করে সন্ধান পান লৌকিকের। বুদ্ধ সম্বন্ধে এটি অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ তিনি নিজেই এ পথ রেখেছেন খোলা। তাঁকে মানুষ হিসেবে বুঝতে ও গ্রহণ করতে কোন রকম শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও সংস্কারকে ডিঙাবার দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় না। সহজাত বুদ্ধি দিয়েই তাঁকে গ্রহণ করা যায়।

অন্ধভক্তির আতিশয্যই ভক্ত ও ভক্তিভাজনের মাঝখানে নানা অলৌকিকতার কৃত্রিম অথচ দুর্ভেদ্য আবরণ রচনা করে। অন্ধভক্তির হাত থেকে বুদ্ধ ও নিষ্কৃতি পান নি। বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করেও বহু কিম্বদন্তী গড়ে উঠেছে। অতিভক্তি বা অন্ধভক্তি শুধু বাস্তব ও যুক্তি নিয়ে তৃপ্তি পায় না। তাই সে রচনা করে অবাস্তব ও অযৌক্তিক কল্পনার বিচিত্র মায়াজাল। এসব না হলে সাধারণ মানুষের মন ও মানস খোরাক পায় না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের মত বৌদ্ধরাও এ খোরাক যথেষ্ট পরিমাণে যোগান দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও মানব-পুত্র বুদ্ধ এ সবার নীচে বিশেষ চাপা পড়েন নি। তাঁর জীবন ও বাণীর লক্ষ্য ও পরিধি পরিপূর্ণভাবে মানুষ ও মনুষ্যত্ব এবং মানুষের মনোভূমি।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ক্ষুদ্র লুম্বিনীকাননে এক সামন্ত পরিবারে যে শিশুটির জন্ম হয়েছিল তিনি সর্বতোভাবে মানব-পুত্রই ছিলেন। সেই দূর অতীতে তিনি যে শুধু সামন্ততন্ত্রের মায়া কাটিয়েছিলেন তা নয়, জীবনের বহু সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়াসের লোভও জয় করেছিলেন। মানুষের শোক-দুঃখে তিনি যে কঠোর ও সুদীর্ঘ সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন তারও রূপ ও রূপায়ণ ছিল মানবিক।

আশ্চর্য, তাঁর সাধনালব্ধ শিক্ষা ও বাণী প্রচারের জন্য তিনি স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভীতি—এ দুই আশু-ফলপ্রদ ও সহজ অস্ত্রের প্রয়োগ করেননি কখনো। মানবসভাভা ও মানব-বুদ্ধির সেই শৈশবকালে এ প্রলোভন জয় করাও কম কথা নয়। মানুষের মধ্যে যে-টুকু জন্তুভাব আছে তা দূর করে মানুষাত্বের উদ্বোধনের জন্য তিনি যে সব পথ বাৎলিয়েছেন তাতে দৈবশক্তির কোন দোহাই নেই এবং সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছরেও তা কিছুমাত্র স্তান হয়নি এবং দিন দিনই তার সত্য উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এখানেই তাঁর মহামানবত্ব।

আড়াই হাজার বছর পরেও এ মানব-পুত্রকে আমরা আবার স্মরণ করছি। একদিন মানবতার যে মহাসমুদ্রের সন্ধান তিনি মানুষকে দিয়েছিলেন, সেই মহাসমুদ্রের হাওয়া আবার দিকে দিকে বয়ে যাক—তার ফলে দুনিয়া থেকে চিরতরে দূর হোক ধর্ম-সম্প্রদায়, দেশ ও জাতিগত বিদ্বেষ। তা হলেই এ মানব-পুত্র মহামানবের স্মরণোৎসব পালন সার্থক হবে।

বৌদ্ধধর্ম ও বিশ্বশান্তি

আমার বিশ্বাস এ বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না—
তুচ্ছাতিতুচ্ছ থেকে বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, অভ্যুত্থান, বিপ্লব,
নতুন ভাবাদর্শ নিয়ে মহামানবের আবির্ভাব ইত্যাদি প্রত্যেক কিছুই
কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ। বৌদ্ধ-ধর্মের পরিভাষায় যাকে বলা হয়
'প্রতীত্যসমুৎপাদ'—তারও মূল কথা বোধ হয় এটি।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, তাঁর সাধনা ও বাণীর কি কোন ঐতিহাসিক
পটভূমি নেই? আমরা জানি বিশ্ববিধানে ইন্দ্রজালের কোন স্থান নেই।
কিছুই স্বয়ম্ভু নয়। মহাপুরুষেরাও হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েন না।
ইতিহাসের দাবীতে যুগের চাহিদায় তাঁদের আবির্ভাব ঘটে। তৃষিত
যুগ-চিন্তে তাঁরা নিয়ে আসেন অমৃত বারি। সব মহা-পুরুষদের
বেলায়ই এ কথা সত্য। তবে স্মরণীয় তাঁরা যুগ-চেতনার প্রতিনিধি
বটে, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে থাকে যুগাতীত বাণী, হাতে থাকে চিরন্তন
মনুষ্যাত্মের দীপশিখা।

বুদ্ধদেবেরও আবির্ভাব ঘটে এ উপমহাদেশের এক চরম সঙ্কটের
দিনে, যখন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বোধ অধঃপতনের প্রায় শেষ
ধাপে, ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের নামে মানুষ যখন জীব হত্যায় উন্মত্ত,
মানুষ শুধু নয়, দেবতাও যখন দেবত্ব ছেড়ে হয়ে উঠেছে রক্তপিপাসু।
যুগাত্মার সাক্ষাৎ প্রতীক বুদ্ধদেবের মুখে তখনই ধ্বনিত
হল—'অহিংসা পরম ধর্ম।' মুহূর্তে ইতিহাসের গতিধারা যেন স্তব্ধ হয়ে
গেল। বিস্ময়-বিমূঢ় মানুষ ফিরে তাকালো নিজের মনের দিকে।

প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন বীর্যবন্ত প্রতিবাদ ইতিপূর্বে আর শোনা যায়নি। শুনে মনুষ্যভেদর, আত্মার দিকে ফিরে তাকালো বিভ্রান্ত মানুষ, মানুষের হলো নবজন্ম, হলো আত্মার নতুন করে উদ্বোধন।

রাজ-সিংহাসনের তুচ্ছ শীর্ষ থেকে, পারিবারিক সাংসারিক সুখ-সম্পদের আরাম শয়্যায় বসে এই প্রতিবাদ করলে তো লোকের কানে পৌঁছলেও হৃদয়ে কখনো পৌঁছতনা। কিন্তু সর্বত্যাগী এই রাজ-ভিক্ষুর সুদীর্ঘ ছয় বছর অবর্ণনীয় কঠোর সাধনার দ্বারা লব্ধ এই অগ্নিবাহী তাই ব্যর্থ হওয়ার নয়—নয় তা দেশ-কালের সংকীর্ণ গভীর মধো সীমাবদ্ধ। এই সত্যের উত্তরাধিকার সব মানুষের, সব দেশের ও সব যুগের। বুদ্ধদেব শুধু মৌখিক বা মামুলী প্রেমের বুলি, মৈত্রীর কথা বা অহিংসার বাণী আওড়াননি। নিজের জীবনে তা তিনি পালন করেছেন, শিষ্যদের পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কঠোর ব্রতধারী ভিক্ষু ভিক্ষুনিদের দৈনন্দিন জীবন হয়েছে এই নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আজকের দিনেও আমরা শান্তির কথা মৈত্রীর কথা চারদিকে এবং যখন তখন শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এই শান্তি হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের মৌখিক বুলি, এর সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই, নেই মনুষ্যভেদর যোগাযোগ। এটা নিছক ব্যক্তিগত, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হাসিলের এক রকম ফন্দি-ফিকির মাত্র। ব্যক্তি তথা মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু কাগজ-পত্রে শান্তির বাণী প্রচার করলে তা ভাল প্রপাগান্ডা হতে পারে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা তাতে হবেনা। তাই আমাদের জীবদ্দশায় আমরা দু'দুটো নরমেধ-যজ্ঞ দেখতে পেলাম। এখনও পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই, বিশেষ করে সামরিক শক্তি-মত্ত দেশগুলি অহরহ মুখে শান্তির বাণী আওড়াচ্ছে আর হাতে কলমে তৈরী করেছে বিচিত্র ও বিপুল ধ্বংসের আণবিক বোমা। হাতে এদের আণবিক

বোমা, মুখে শান্তির ললিত বাণী। কপটতা ও আত্ম-প্রবঞ্চনার এমন লজ্জাকর রূপ ইতিহাসে বোধ করি দ্বিতীয় বার দেখা যায়নি।

ব্যক্তি বা মানুষই হল সমাজের ও রাষ্ট্রের এক একটি অঙ্গ—সেই মানুষ যদি সৎ না হয়, সেই মানুষের মন থেকে যদি অবিদ্যা দূরীভূত না হয়, সেই মানুষ যদি ‘মধ্যমা প্রতিপদ’ গ্রহণ না করে—মোট কথা ব্যক্তি মানুষের মন থেকে যদি হিংসা-বিদ্বেষ নির্মূল না হয় তা হলে বিশ্ব-শান্তি চিরকালই মানুষের নাগালের বাইরে বন্য হংস হয়েই থাকবে। মনের ভিতর ছুরি শান দিতে দিতে মুখে শান্তির বাণী আওড়ালে যে শান্তি নেমে আসবে তা হচ্ছে কবরের শান্তি, শ্মশানের শান্তি, তা কখনো জীবনের শান্তি নয়। জীবনের শান্তির পথ আমরা খুঁজে পাব মহামানব বুদ্ধের জীবনসাধনায়—তার শিক্ষা, বাণী ও নির্দেশে। আজকের জিঘাংসা-উন্মত্ত পৃথিবীর মানুষের কানে কি সেই শান্তির বাণী প্রবেশ করবে? সে যে দূরূহ সাধনার পথ—সর্বত্রাসী হিংসা, বিদ্বেষ, উগ্রতা ও অজ্ঞতা পরিহার করে অহিংসার সাধনা, মধ্যমা প্রতিপদের সাধনা, প্রজ্ঞার সাধনা কি মানুষ গ্রহণ করবে? যদি করত তাহলে আর একটা মহাযুদ্ধের আতঙ্কে পৃথিবীর নাভিশ্বাস উঠত না। আজ মানুষ স্বস্তিবোধ করতে পারত, ঘরে ঘরে নেমে আসত শান্তি।

বুদ্ধদেবের সার্থক চরিতকার অশ্বঘোষ বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন, ‘তৃষিত জীবলোক এই উত্তমা ধর্মনদীর জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। প্রজ্ঞাস্রোতে এ নদী বেগবতী, স্থির বিনয় ব্যবহারই এ নদীর তটকে দৃঢ় ও সমাধি এর জলকে শীতল করেছে, আর এই উত্তমা নদীর জলে ব্রতচারী চক্রবাকেরা ক্রীড়া করেছে’। কাব্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভাষায় বৌদ্ধধর্মের মর্মোদ্ঘাটন করেছেন এই ভাবে ভাষা-শিল্পী অশ্বঘোষ।

সুবিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ‘ধম্মপদে’ বুদ্ধ বলেছেন : ‘বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরিহীন হয়ে সুখে জীবন যাপন করব, বিদ্রোহ ভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্রোহশূন্য হয়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে ক্লেশরহিত হয়ে সুখে জীবন যাপন করব ও বিচরণ করব। আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হয়ে সুখে জীবন যাপন করব ও বিচরণ করব।’ ইত্যাদি।*

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত : আমাদের এ যুগ মহাপুরুষের যুগ নয়, মহৎ কথা বা মনুষ্যত্ব সাধনার যুগ নয় এটি। এই যুগ হচ্ছে স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রবিদদের যুগ, ফাঁকা বুলির যুগ। তাই মনে হচ্ছে আজকের দিনে পৃথিবীব্যাপী যে বুদ্ধ-বন্দনা চলছে তাও অনেকখানি ফাঁকা—লোক দেখানো ব্যাপার। তবুও এও একেবারে মূল্যহীন নয়, সত্যিকার মহাপুরুষদের নিছক লোকলজ্জার খাতিরে স্মরণ করলেও তা ব্যর্থ হয় না। এর ফলে কারো না কারো মনে মহাবুদ্ধের সাধনা-লব্ধ প্রজ্ঞা পারমিতার স্পর্শ ঘটতে পারে, তা হলে বুদ্ধ না হউন তিনি যে জীবনের মহাসত্য প্রবুদ্ধ হবেন এতে সন্দেহ নেই। আজ বুদ্ধের পঞ্চাশীল রাজনৈতিক বুলি না হয়ে জীবনের বাণী হউক। তা হলেই নিঃসন্দেহে ঘরে ও বাইরে, দেশ ও বিদেশে সর্বত্র আমরা শান্তির মুখ দেখতে পাব।

১৯৫৮

* প্রবোধ চন্দ্র বাগচীর অনুবাদ।

বুদ্ধের জীবন-দর্শন

মানুষের ইতিহাস সুদীর্ঘ—এ দীর্ঘ ইতিহাসে মানুষের জীবন আর জীবনের পরিণতি, তার ইহ-পরকাল আর সুখশান্তির ভাবনা-চিন্তায় যে গুটিকয়েক মহামানব জীবন উৎসর্গ করেছেন তার মধ্যে মহাপুরুষ বুদ্ধ শুধু অন্যতম নন—এক অনন্য আসনেরও তিনি অধিকারী। অন্যান্য বৃহৎ ধর্ম-প্রবর্তক ও প্রচারকেরা প্রায়ই সবাই ছিলেন প্রেরিত পুরুষ—অন্তত তাই তাঁরা বলে গেছেন। তাঁদের বাণী ঈশ্বরের বাণী, তাঁদের শিক্ষা ঈশ্বর-নির্দেশিত ও ঈশ্বর-আদিষ্ট। তাঁরা সর্বতোভাবে ঈশ্বরের মুখপাত্র ও তাঁরই প্রতিনিধি ও দূত। এমনকি কেউ কেউ ঈশ্বরপুত্র বা অবতাররূপেও হয়েছেন চিত্রিত ও বর্ণিত। অনুরক্ত ভক্তদের কাছে এসব অশ্রান্ত বিশ্বাসে পরিণত। আর ঐসব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের একাধিক বৃহৎ ধর্ম-সম্প্রদায় ও সে সব সম্প্রদায়ের জীবন-দর্শন আচার-আচরণ।

বুদ্ধ নিজে তেমন কোন দাবী করেননি—কোন রকম অলৌকিক শক্তির ইংগিত বা নির্দেশে তিনি নূতন কোন ধর্ম-প্রচারে হননি ব্রতী। বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তিনি লাভ করেছেন তাঁর ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা। তাঁর সব রকম প্রজ্ঞা আর পরিণামে বুদ্ধত্বলাভও এ অভিজ্ঞতার পথেই হয়েছে আয়ত্ত। কোন রকম অপৌরুষেয় শক্তির সহায়তা ছাড়াই তিনি পৌঁছেছেন প্রজ্ঞা পারমিতায়—সিদ্ধিলাভ করেছেন শ্রেয় জীবনের অভিজ্ঞতাকে ধ্যান আর সাধনায় রূপান্তরিত করেই। এদিক দিয়েও তাঁর সাধনা ও

মনীষা মানুষের জন্য এক বিরাট বিজয়। মানুষের অভ্যন্তরে এক অনন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে, আর নিজের সাধনা আর তপস্যায় মানুষ যে কত উঁচুতে উঠে যেতে পারে, তার এক সাক্ষাৎ নিদর্শন মহামানব বুদ্ধের জীবন। তিনি নির্ভর করেননি কোন অলৌকিক শক্তির উপর—তুলে ধরেননি মানুষের সামনে অপার্থিব কোন আশা আশ্বাস বা ভয়ভীতি কি প্রলোভন। তাই তাঁর ধর্ম-দর্শনে ঈশ্বর যেমন অনুপস্থিত, স্বর্গ-নরকও তেমনি গৌণ। বৌদ্ধধর্মের এ এক বড় বৈশিষ্ট্য—অন্য ধর্মের সাথে এখানেও রয়েছে ধর্ম-দর্শনে তার বিরাট পার্থক্য। সজ্জীবন যাপন আর সদাচরণই বুদ্ধের শিক্ষা—তাহলেই লাভ হবে মোক্ষ বা নির্বাণ। নির্বাণ মানে বার বার জন্মে জীবনযন্ত্রণা থেকে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করা। জন্মান্তর-দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, তাই আমাদের বোধগম্যও নয় তা। মনে হয় এটি হিন্দু-দর্শনেরই সহোদর—অন্তত তারই বর্ধিত রূপ।

বুদ্ধের এক বড় বৈশিষ্ট্য বাস্তববোধ। নিজের জীবনের চার পাশে বুদ্ধ জীবনের বহুবিধ যন্ত্রণা দেখেছেন—যা দেখে তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছেন। শেষে গৃহ-সংসার সুখ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন এ জীবন-যন্ত্রণা উপশমের সন্ধানে। জীবন-যন্ত্রণা থেকেই তিনি পৌঁছেছেন জীবনপ্রীতিতে। এ জীবন-প্রীতিরই সাক্ষাৎ ফল অহিংসা বা সর্বজীবে প্রেম। বলাবাহুল্য জীবন-যন্ত্রণা সব মহাভাবেরই উৎসমুখ। এমন কি মহৎ শিল্প-কর্মেরও। পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের উৎপত্তিও এভাবেই ঘটেছে। চারদিকে জীবন-যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখনই আবির্ভাব ঘটে তার ত্রাতারও। তাই যুগাভীত হয়েও মহাপুরুষরাও যুগ-সন্তান। তাঁদের জীবন-দর্শনে আর ধর্ম-দেশনায়ও তাই যুগ-পরিবেশ তথা যুগ-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন এ কারণেই অনিবার্য।

বুদ্ধের যুগে ভারতবর্ষে যাগ-যজ্ঞ-বলি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এক নির্মম অমানুষিকতায় পরিণত হয়েছিল—বুদ্ধের জীবন-দর্শন এ সবেই মূর্ত প্রতিবাদ! তাঁর যুগে তাঁর মতো অত বড় সমাজ-বিদ্রোহীর দ্বিতীয় কোন তুলনা নেই—তিনিই সর্বাত্মে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সব রকম জীব-হত্যা, রহিত করলেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অস্বীকার করলেন জন্মগত আভিজাত্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর শিষ্য আনন্দের জবানীতেই প্রকাশিত হলো তাঁর বাণী এভাবে :

জন্ম হেতু কেহ কভু চণ্ডাল না হয়,

জন্মের কারণে কেহ ব্রাহ্মণ তো নয়।

চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ আখ্যা কর্মে প্রাপ্ত হয়,

সম্মুখের বাণী ইহা জানিবে নিশ্চয়।

[শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির প্রণীত 'আনন্দ' পৃঃ ১৪১]

এভাবে আড়াই হাজার বছরেরও অধিককাল আগে মহামানব বুদ্ধ মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। জন্ম তো আকস্মিক ব্যাপার, তা নিয়ে গর্ব বা কৃতিত্বের দাবী চলে না। কর্ম তথা সৎকর্ম সজ্ঞান সাধনা আর ত্যাগ শ্রমের ফল—মানুষের স্বোপার্জিত সম্পদ। বুদ্ধ সে সম্পদেরই জয় ঘোষণা করেছেন। পড়ে-পাওয়া বা আরোপিত গৌরব গৌরবই নয়—তেমন গৌরব ধার-করা, বাবুগিরির মতই সর্বনেশে। সেদিনের ভারত-সমাজকে তিনি সে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন কর্মের গৌরব ঘোষণা করে। পরবর্তী যুগে তাঁর এ উদাত্তবাণী ভুলে ভারত-সমাজ যে আবার কর্মের আভিজাত্য ত্যাগ করে জন্মের আভিজাত্যে ফিরে গিয়েছিল তার বিষময় ফল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি। দুঃখের বিষয় আজো এক বৃহৎ সম্প্রদায় এ বিষময় ও আত্মঘাতী ধারণা থেকে অব্যাহত পায়নি। মহাপুরুষেরা আলোকবর্তিকা, তাঁরা মানুষকে পথ দেখিয়ে দেন, সে

পথ ধরে চলার দায়িত্ব অবহেলা করলে তার ফলভোগী মানুষকে হতেই হবে। ভারতের বহু দুর্ভোগের অন্যতম কারণ যে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা তা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত।

এ বিংশ শতাব্দীতেও—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতায় এত উন্নতির যুগেও বহু দেশে ও বহু সমাজে মানুষ কর্ম বিচারকে প্রাধান্য না দিয়ে ধর্ম তথা সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও গায়ের বর্ণকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজেদের জীবনে ডেকে এনেছে বহু সংকট। এর ফলে বহু সভ্য দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসও হয়েছে বারে বারে রক্তরঞ্জিত ও কলঙ্কিত—এখনো হচ্ছে। বুদ্ধবানী ও জীবন-দর্শন এসবের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদের প্রতি কান দিলে মানব-সভ্যতার অশেষ কল্যাণ হতো, মানুষ বেঁচে যেতো বহু দুঃখ-দুর্গতির হাত থেকে।

বুদ্ধ মানুষ আর মানবতায় বিশ্বাসী ছিলেন—তাই এমন কোন আদেশ-নিষেধ তিনি প্রচার করেন নি যার ফলে মানুষের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অঙ্গ আনুগত্যের তিনি বিরোধী ছিলেন—চিন্তার স্বাধীনতার মূল্য তিনি বুঝতেন ও দিতেন তার স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির এক অকুণ্ঠ স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর অন্তিম বাণীতে, ‘হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার মাত্রই ধ্বংসশীল। আপন কর্তব্য অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন করো।’ [আনন্দ : পৃঃ ২২৯]

অনেক সংস্কার মানুষের পক্ষে জগদ্দল পাথর হয়ে ওঠে—তার বাঁধনে অনেক সময় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে মানুষের মন, বিবেক ও বুদ্ধি। ফলে অপ্রমাদে কর্তব্য সম্পাদন হয়ে পড়ে অসম্ভব। ধর্ম-প্রচারকরা অনেক সময় নিজেদের ভক্ত আর শিষ্যদের মন আর বুদ্ধিকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখতে চান—বুদ্ধ তা চান নি, তিনি ভক্ত আর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন মন আর বুদ্ধিকে সংস্কারমুক্ত রাখতে। তাঁর নির্দেশ আর

শিক্ষা বুদ্ধির মুক্তির ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দিগ্‌দর্শন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের মূল কথা : সব দুঃখের কারণ—তৃষ্ণা। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা লোভ সংবরণ তথা সর্ব আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হওয়াই চরম কাম্য। এ কাম্য ধামে পৌঁছার, বৌদ্ধ পরিভাষায় যাকে বলা হয় নির্বাণ, কয়টি মার্গ বা পথ তিনি নির্দেশ করেছেন সংক্ষেপে যার নির্গলিত অর্থ : ইন্দ্রিয়দমন, স্বার্থত্যাগ ও স্থিরবুদ্ধি।

বলাবাহুল্য, এ সবই যে মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই—শুধু মনুষ্যত্ব বিকাশের নয় সব রকম দ্বন্দ্ব-বিরোধ পরিহারেরও এক রাজপথ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন, তেমনি সমষ্টিগত তথা জাতি ও সম্প্রদায়গত পর্যায়েও। স্থিরবুদ্ধি কথাটা খুবই মূল্যবান। স্থিরবুদ্ধি মানুষ কখনো কোন অপরাধ বা অঘটন ঘটাতে পারে না—পারে না নিজের বা অপরের দুঃখের কারণ হতে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অনাচার, অশান্তি সবই অস্থিরমতিদেরই কাণ্ড। ইন্দ্রিয়দমন ও স্বার্থত্যাগ এ দুই প্রাথমিক শর্ত পালন করেই মানুষ স্থিরবুদ্ধি হতে পারে। কাজেই এ তিন একসূত্রে গ্রথিত। ‘মধ্যমা প্রতিপদা’ অর্থাৎ মধ্যমার্গ ধরেই চলো, বুদ্ধের এ নির্দেশের সঙ্গে আমাদের ধর্মের শিক্ষার সঙ্গেও আশ্চর্য মিল রয়েছে। আমাদের ধর্মেও বলা হয়েছে—কোন রকম বাড়াবাড়ি করো না, দুই চরম ত্যাগ করে মাঝামাঝি পথ ধরেই চলো। বলাবাহুল্য এও শান্তির পথ। বুদ্ধের যে শিক্ষা, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অহিংসা তথা সর্বজীবে দয়া। এ পথই যে বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকার কথা নয়।

মহামানব বুদ্ধ

এক কালে ধর্মই মানুষের জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো—এখন সে দায়িত্ব অনেকখানি রাষ্ট্র, সমাজ আর বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে। সব ধর্মকেই আজ এ ত্রয়ীর মোকাবেলা করতে হচ্ছে—এ মোকাবেলায় যে ধর্ম টিকে থাকতে পারবে না তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবেই, তার আবেদন ব্যর্থ না হয়ে পারে না। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাস্তব চেতনা আর ঐহিকবোধ অনেক বেড়ে গেছে—শুধু পারলৌকিক ভালমন্দের আবেদনে আজ মানুষের মন কিছুমাত্র সাড়া দেয় না। যে জীবনটা তার হাতের মুঠোয়, ওটার হিতাহিত নিয়েই তার এখন ভাবনা—কঠিন বাস্তব তাকে আর দিচ্ছে না আকাশচারী হতে। পরলোকের মুক্তির কথা ভেবে মানুষ আজ মোটেও বিচলিত নয়—এখন মানুষ মুক্তি চায় ইহলোকের দুঃখ দুর্গতি আর অভাব-অনটনের কবল থেকে। আজ মানুষ মানুষকে যতখানি ভয় করছে তার সিকির সিকিও ভয় করছে না ঈশ্বরকে কিম্বা ঈশ্বরের দণ্ডকে। তাই পরলোকের ভয়ভীতি ও প্রলোভন আজ মানুষের জীবনে অনেকখানি অবান্তর। এ কারণে ধর্মের প্রতিও আজ নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে হবে—ধর্মকেও আজ বিচার করতে হবে ঐহিক মাপকাঠি দিয়ে।

বুদ্ধের জীবন আর শিক্ষা পুরোপুরি ঐহিক ভিত্তিক বলে এ মাপকাঠি দিয়ে তার মূল্যায়ন অধিকতর সহজ—এর ফলাফল চাক্ষুষ আর প্রত্যক্ষ! বুদ্ধ নিজেও কাল্পনিক ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করেন নি। তেমন উপদেশ তিনি দেননিও। প্রতিদিন বাস্তব জীবনে যে সব সমস্যায় মানুষের অস্তিত্ব জর্জরিত তার অপনোদনের পথ আর উপায়—ই তিনি নির্দেশ করেছেন। আর তা কিছুমাত্র সাধ্যাতীত নয় মানুষের। কোন রকম অলৌকিক শক্তির দোহাই বুদ্ধ দেননি—জানাননি তেমন

কিছুর প্রতি স্বীকৃতিও। সর্বতোভাবে এ জীবনকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এর বৃত্ত ছড়িয়ে যাবার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। এ প্রত্যক্ষ জীবনকে ডিঙিয়ে অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ জীবনের স্বপ্ন তাঁর কল্পনায় পায়নি স্থান। তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধর্ম ও তাঁর আবেদন এ জীবনের জন্যই। সমস্ত অবৈধ বাসনা-কামনার কবল থেকে মুক্ত করে এ জীবনকেই চেয়েছেন তিনি সুন্দর আর সুস্থ করে গড়ে তুলতে।

মানুষের অন্তরেই মানুষের সব দুঃখের বীজ নিহিত—এ মহাসত্যের তিনি আবিষ্কর্তা। আর তার মূল উৎপাতনই তাঁর সব শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পরলোকে স্বর্গ-নরক থাকলেও এ জীবনে তার কোন মূল্য নেই—কাজেই তাঁর কথা ভেবে শঙ্কিত বা উচ্ছ্বসিত হওয়া বা তার উপর জোর দেওয়ার কোন মানে হয় না। তাই সে সম্বন্ধে মহামানব বুদ্ধ মোটেও মাথা ঘামাননি। তিনি মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর সব চিন্তা-ভাবনাও মানুষের জীবন-পরিধিতেই সীমিত। মানুষের এ জীবনের কল্যাণ আর এ জীবনের মুক্তিই তিনি চেয়েছেন—এ উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছেন তাঁর জীবন আর জীবনের সবকিছু। সিদ্ধি খুঁজেছেন এ জীবনের পরিমণ্ডলেই।

অন্য সব ধর্মেই ঈশ্বর, আল্লাহ, গড্, ভগবান, দেবতা ইত্যাদি এক বড় স্থান জুড়ে রয়েছে, আর রয়েছে পরলোকের সম্ভাব্য জীবন। একমাত্র বুদ্ধের শিক্ষায় মানুষই বড় আর একমাত্র হয়েই দেখা দিয়েছে। সে-মানুষ সমাজ, রাষ্ট্র আর বিজ্ঞানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। অলৌকিকতা এ জীবনে হালে পানি পায় না। তাই বোধ করি বুদ্ধের শিক্ষা ও আবেদনে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সম্ভবত : বৌদ্ধ ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা মানুষের তৈয়ারী আর সর্বতোভাবে তা মানুষের জন্যই এবং মানুষকে নিয়েই। এদিক দিয়ে একে মানবধর্মই বলা যায় আর এ ধর্মের প্রবর্তককে সত্যার্থেই বলা যায় মহামানব। মহামানব বুদ্ধের জয় হোক। জয় হোক তাঁর অহিংসা মন্ত্রের আর জীবন-চেতনার।

বুদ্ধ : এক আলোকবর্তিকা

বুদ্ধকে অন্য এক লেখায় আমি ‘মানব পুত্র’ বলেছি। কথাটা আমার কাছে অর্থপূর্ণ। আর সে অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং সার্বিক। মানব স্বভাবের এত গভীরে অন্য কেউ প্রবেশ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। সত্যের সন্ধানে তিনি নিজে সংসার ত্যাগ করেছেন : কিন্তু প্রচলিত আত্মনির্যাতন-মূলক সন্ন্যাসকে করেছেন নিন্দা। মানুষের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেন নি কিন্তু অতিরেক আর অভিচারকে করেছেন নিষিদ্ধ। মানুষকে হতে বলেছেন মধ্যপন্থের অনুসারী। আর বলেছেন, এ হচ্ছে ‘প্রজ্ঞা পারমিতা’ মানে পরিপূর্ণ বিজ্ঞতা তথা Supreme Wisdom—যেখানে ভুল-ভ্রান্তির নেই কোন অনুপ্রবেশ।

প্রাণের অধিকারী বলে মানুষও প্রাণী—প্রাণহীন মানুষ স্রেফ জড় বস্তু, তখন জড় বস্তুর বেশী তার আর কোন মূল্য থাকে না। কাজেই প্রাণ এক অমূল্য সম্পদ, এক দুর্লভ ধন। মানুষই শুধু প্রাণের অধিকারী নয়—আরো অজস্র প্রাণী রয়েছে মর্ত্যধামে। বুদ্ধি আর বিজ্ঞতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ যুক্তি—যুক্তি বলে সব প্রাণই অমূল্য, শুধু মানুষের প্রাণটাই মূল্যবান এ বুদ্ধি কিম্বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অবিশ্বাস্য সাধনা আর দীর্ঘ আত্মনিবিষ্ট ধ্যানে মহামানব বুদ্ধ এ মহাসত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে, সব প্রাণই মূল্যবান, সব প্রাণই পবিত্র। প্রাণ-হনন এক গর্হিত কর্ম। সর্ব জীবে দয়া, অহিংসা পরম ধর্ম,—এমন কথা আড়াই হাজার বছর আগে সত্যই অকল্পনীয় ছিল। মানবসভ্যতার তখনো শৈশবাবস্থা—জীবহত্যা তথা প্রাণী-শিকার তখনো তার অন্যতম

জীবিকা। যুবরাজ সিদ্ধার্থই ছিলেন এর প্রথম অপবাদক। তখন বীরত্বের বা ক্ষত্রিয় ধর্মের পরাকাষ্ঠাই ছিল মৃগয়া বা পশু-শিকার। সিদ্ধার্থও ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশাবতংস।

তাই, ভেবে অবাক হতে হয় তেমন যুগে তেমন পরিবেশে কি করে একটা মানুষের এমন রূপান্তর ঘটলো। কোন অলৌকিক কিম্বা অপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয় তিনি নেননি, যাননি তেমন অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অপ্রামাণ্য শক্তির কাছে। সর্বতোভাবে নির্ভর করেছেন আত্মশক্তির উপর, নিজের সাধনা আর আত্মোপলব্ধির উপর। আত্মোন্মোচন ঘটেছে তাঁর এভাবে। এভাবে ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম পৌঁছেছেন বুদ্ধত্বে। মানবিক সাধনার এক চরম দৃষ্টান্ত বুদ্ধ-জীবন। ত্যাগ-সংযমের পথে যে সাধনা তাই মূল্যবান ও ফলপ্রসূ। শ্রেফ উপাসনা কিম্বা কর্মহীন প্রার্থনার কোন মূল্য নেই, তা শুধু নিষ্ক্রিয়তা আর জড় অভ্যাসেরই দিয়ে থাকে প্রশ্রয়। এতে কোন আত্মোন্মতি ঘটেনা, ঘটেনা কোন রকম আত্মোপলব্ধি। অপরিসীম আর অবিরাম চেষ্টা আর উদ্যম-উদ্যোগ ছাড়া আত্মোন্মতি কিম্বা আত্মোপলব্ধির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আত্মোন্মতি ও আত্মোপলব্ধিরই এক নাম প্রজ্ঞা। অন্যান্য বহু ধর্মে বিশ্বাসের রয়েছে এক বড় স্থান, বিশ্বাসের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয় ঐসব ধর্মে। বুদ্ধ তা করেননি। তাঁর মতে কর্মহীন উপাসনা যেমন নিষ্ফল তেমনি নিষ্ক্রিয় জড় বিশ্বাস ও মূল্যহীন। মানুষের যা কিছু উপার্জন তা কর্মোদ্যমের পথেই লভ্য। জ্ঞানের তথা প্রজ্ঞা-পারমিতার যে আলোক-বর্তিকা বুদ্ধ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তাও তিনি লাভ করেছেন এ পথেই। মনে হয় বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে—ব্যক্তিগত সাধনা ছাড়া তিনি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করেননি। তাঁর জীবন ও শিক্ষা ব্যক্তিগত সাধনারই জয় ঘোষণা।

আত্মোপলব্ধির তথা প্রজ্ঞা-পারমিতায় পৌঁছার জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেসবের দিকে তাকালেও বুঝতে পারা যাবে তিনি সর্বতোভাবে ব্যক্তিক সাধনার উপর দিয়েছেন জোর। দল বা সমাজবদ্ধভাবে আত্ম-উন্নতি ঘটেনা, আত্ম-উন্নতি ঘটে ব্যক্তিগত চেষ্টা, শ্রম আর সংযমের পথে। তাঁর নির্দেশিত পঞ্চশীলের সবক'টা শীলই ব্যক্তিগতভাবে আচরণীয় ও পালনীয়। প্রাণীহত্যা, পরস্বাপহরণ, অবৈধ যৌন সম্বোগ না করা, মিথ্যা পরনিন্দা কিম্বা রূঢ় কথা না বলা, মদ আর নেশাজনক বস্তু গ্রহণ না করা—ব্যক্তিগত জীবনে সংযম আর ত্যাগ ছাড়া এসব হওয়ার নয়। আনুষ্ঠানিক উপাসনা আর প্রার্থনার সাহায্যে এসব আয়ত্ত্ব হতে পারে না কিছুতেই।

বুদ্ধের এসব নির্দেশ পালন খুব কঠিন বটে কিন্তু এতে কোন রকম জটিলতা কিম্বা দুর্জয়েতা নেই, এ অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। রহস্যঘেরা দার্শনিক জটিলতাকে বুদ্ধ কোনদিন দেননি প্রশ্ন। যেমন অনেক ধর্মের কোন কোন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন তোলেন : মানুষ কে, কি? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? এ ধরনের অর্থহীন তথা উত্তর-বিহীন প্রশ্নকে বুদ্ধ কখনো আমল দেননি। এসব প্রশ্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু পারে না তাকে সংজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। বুদ্ধের তাবৎ কথা ও কাজের মূল লক্ষ্য সং-মানুষ ও সং-জীবনের পথ-নির্দেশ। চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে ক্রমাগতই মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মানসজীবনে বিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রাচীন বহু বিশ্বাস আর সংস্কার ত্যাগ করে মানুষ এখন অধিকতর আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রগামী।

একদিন মানুষ জল-বাতাস-অগ্নি আর চন্দ্র-সূর্যকে, এমনকি বজ্র আর মেঘগর্জনকেও দেবতা মানতো। কিন্তু এখন মানেনা কেন? কারণ

এখন মানুষের বোধ আর বোধি অনেক বেড়েছে, কালের সঙ্গে সঙ্গে তার মানব-জীবন হয়েছে অনেক উন্নত। বুদ্ধের শিক্ষা আর নির্দেশ জীবনে গৃহীত হলে মানুষের আরো যে আত্মবিকাশ ঘটবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা। এও বুদ্ধের এক অবিনশ্বর বাণী। এভাবে অতিপ্রাকৃত ও পরনির্ভরতার গ্লানি থেকে তিনি মানুষকে দিয়েছেন মুক্তি।

কথা আছে : মানুষ প্রবৃত্তির দাস। এ দাসত্ব থেকে মুক্তি ছাড়া মানুষ কখনো পরিপূর্ণ বোধ আর বোধিতে পৌঁছতে পারে না। একমাত্র আত্মশুদ্ধির পথেই এ দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্ভব—সে পথের নির্দেশ রয়েছে বুদ্ধ-জীবনে, বুদ্ধের শিক্ষা আর বিধি-বিধান, আদেশ আর নিষেধ।

মানুষ এখন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেক সভ্য হয়েছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে। তবুও পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। সংকটে, সংঘর্ষে পৃথিবী আজ জর্জরিত। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর এসব মারামারি, খুনোখুনিতে যে হারছে তার যেমন শান্তি নেই তেমনি শান্তি নেই জয়ী হচ্ছে যে তারও। ব্যক্তির বেলায় যেমন এ সত্য তেমনি দেশ ও জাতির বেলায়ও এ একবিন্দু মিথ্যা নয়। বুদ্ধ-শিষ্য অশোক জীবনের এ মহাসত্য দু'হাজার বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর মন্ত্র-গুরু বুদ্ধের জীবনাদর্শ আর শিক্ষার আলো। তাই বিজয়ী হয়েও জয়ের ফল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ত্যাগ আর অহিংসার জীবনকে নিয়েছিলেন বরণ করে। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।

বুদ্ধ-জীবন মানুষের কাছে এক অবিনশ্বর আলোক-বর্তিকা—এ আলোক-বর্তিকা একদিন সম্রাট অশোককে যেমন সত্য, মনুষ্যত্ব

আর শান্তির পথ দেখিয়েছিল, আজকের দিনেও সে পথ দেখাতে তা সক্ষম যদি মানুষ সশ্রদ্ধ চিন্তে এ আলোক-বর্তিকার দিকে নতুন করে ফিরে তাকায় আর বরণ করে নেয় তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ।

বুদ্ধ আর বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে আমাদের অর্থাৎ অ-বৌদ্ধদের মনে একটা রহস্য-ঘন বিস্ময় রয়েছে । এ বিস্ময়ের বড় কারণ অপরিচয় । বৌদ্ধ-বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে যারা জন্মাননি তাঁদের কাছে বুদ্ধ-জীবন আর বৌদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক কিছুই দুর্জ্ঞেয়—বিরাট বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের মহাসমুদ্র মন্থনের যোগ্যতা, ধৈর্য্য আর নিষ্ঠা আমাদের অনেকেরই নেই । ফলে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি থেকেও পরস্পরের ধর্ম ও ধর্মাচরণ সম্বন্ধে আমরা থেকে যাই অজ্ঞ । অজ্ঞতাই জন্ম দেয় বহু অবিশ্বাস আর সংশয়-সন্দেহের—যা কালক্রমে ঘৃণা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ আর নানা অশুভ ক্রিয়া-কর্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । ধর্ম-বিশ্বাস ও চেতনা মানুষের গভীরতম সত্তার সঙ্গে জড়িত—তাই কোন মানুষকে সম্যকভাবে জানতে হলে তার এ সত্তার সঙ্গেও পরিচয় অত্যাৱশ্যক । সে পরিচয়ের কোন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে যেমন নেই তেমনি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও তার অনুকূল নয় । এর ফলে আমাদের জ্ঞান যে শুধু খণ্ডিত থেকে যায় তা নয়, একটা সুসংহত জাতি কিম্বা সমাজসত্তা গড়ে ওঠার পথেও আমাদের দেশে এ হয়ে আছে এক দুরতিক্রমা বাধা । অন্ততঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাত্যাভিমান তথা ধর্মীয় গোঁড়ামী অত্যন্ত ক্ষতিকর । আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের সব ধর্মাবলম্বীরাই এ অপরাধে অপরাধী ।

মহামানব বুদ্ধের জীবন আর তাঁর শিক্ষা আমাকে আকর্ষণ করে তাঁর মানবিকতার জন্য । মানব চরিত্রের অতলে ডুব দিয়ে তিনি একদিকেখুঁজে বের করেছেন তার ক্রোধ, গ্রানি, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা

ইত্যাদি অন্যদিকে আবিষ্কার করেছেন তাতে অসীম শক্তি আর অনন্ত সম্ভাবনার বীজ—যা অঙ্কুরিত হয়ে রূপ নিতে সক্ষম ‘প্রজ্ঞা পরিপারমিতায়’ অর্থাৎ পূর্ণ বিজ্ঞতায়। মানবিক শত বন্ধনে মানুষ বাঁধা যা সর্ব দুঃখ-কষ্ট আর শোক-সন্তাপের উৎস—এ বন্ধন-মুক্তির উপায় ও পথ বাৎলিয়েছেন বুদ্ধ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, যার অর্থ : মানুষকে অধ্যয়ন করেই জানতে হয় মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বকে জানার প্রধানতম উপায় মানুষকে জানা, মানুষকে অধ্যয়ন করা।

মহাপুরুষ বুদ্ধ তাই করেছেন। মানুষকে অধ্যয়ন করেই তিনি জেনেছেন মানুষের মুক্তির নিদান। প্রজ্ঞার বিদ্যুৎঝলক যে তাঁর মনে সর্বপ্রথম ঝলসে উঠেছিল সে-ও তো পীড়িত, জরাগ্রস্ত আর মৃত মানুষকে দেখেই। যার ফলে মুহূর্তে শুধু যে তাঁর ব্যক্তি-জীবনে রূপান্তর ঘটে গেল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হলো তাঁর অন্তর্লোকে সত্যের, করুণার আর প্রেমের এমন এক সূর্য-করোজ্জল দীপ্তি যার কোন তুলনা হয় না। এ মহাসত্যের পথ ধরেই শুরু হলো তাঁর সাধনা—যে সাধনার লক্ষ্য মানুষ আর মানুষের অন্তর্জীবন এবং তার রহস্য সন্ধান। সে সন্ধানে তিনি সফল হয়েছেন। হয়েছেন ‘জিন’ বা জয়ী। মানব সভ্যতার সৃষ্টির যুগে এ সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা। এক রাজপুত্র, সুন্দরী স্ত্রী আর সদ্যোজাত সন্তানকে জীবনের জন্য ছেড়ে সত্যের ও মানবমুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করে এক দুঃসহ বনজীবন বরণ করে নিয়েছেন মানুষের জন্য। এ তো এক অত্যাশ্চর্য শিহরণ। হয়তো মহাপুরুষদের জীবন এমনি অকল্পনীয়, অচিন্ত্যনীয়ই হয়ে থাকে। না হয় তাঁরা মহাপুরুষ হলেন কি করে?

বুদ্ধ-জীবনের মতো ত্যাগ-সাধনা আর মনুষ্যত্বোপলব্ধির এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যি বিরল।

বুদ্ধের শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য নির্বাণ। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস—এ দাসত্বের চেয়ে হীনতম দাসত্ব আর নেই। এ বন্ধন মোচনের বাণীই তিনি শুনিয়েছেন মানুষকে। এছাড়া ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই। ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে চিরমুক্তিরই এক নাম নির্বাণ। ‘বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ’—এমন আগুবাণ্ডে বুদ্ধ বিশ্বাস করেন না। কর্মবিহীন বিশ্বাসতো স্রেফ নিষ্ক্রিয়তা, এতে প্রশয় পায় জড়তা, শ্রম-বিমুখতা। বুদ্ধের শিক্ষা আর ধর্মের মর্মকথাই হলো—অবিরত আর অবিচলিত চেষ্টা। তিনি নিন্দা করেছেন অজ্ঞতা, লোভ আর হিংসা-বিদ্বেষকে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এসবকে জড়শুদ্ধ উৎপাটিত করার দিয়েছেন নির্দেশ। শুধু বিশ্বাস বা উপাস্য কিম্বা আরাধ্যের নাম জপ করলে এ হওয়ার নয়। তাই বিশ্বাস কি উপাসনার উপর তিনি মোটেও জোর দেননি। কারণ এসবের মধ্যে ব্যক্তির কোন প্রচেষ্টা নেই, নিজেকে রূপান্তরিত করার নেই কোন প্রয়াস। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, গড়ে তোলে তার চিন্তা, তার কথা, তার কর্ম। জড় অভ্যাস নয়। তাই মানুষ বিশ্বাসে তোতাপাখী হোক বুদ্ধ এ কখনো চাননি। মানুষ সক্রিয় হোক। প্রয়াসী আর উদ্যোগী হোক এ তিনি চেয়েছেন, দিয়েছেন তেমন বিধান। সন্ন্যাস এসবের বিপরীত, সন্ন্যাসও এক রকম জড়তা। তাই কৃষ্ণ সাধনা ও সন্ন্যাস জীবনকেও তিনি করেছেন নিন্দা। সন্ন্যাস আত্মরতির প্রশয় দিয়ে থাকে, মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তোলে অহংবোধ। এসবের অসারতা বুদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বলেছেন—অকারণে শারীরিক কষ্টভোগ কখনো মুক্তির পথ নয়। নয় শান্তি কিম্বা প্রজ্ঞার পথ। মানব মনের উন্মেষ আর বিকাশ যেখানেই ঘটেছে, তা সবই চেষ্টা, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের পথেই হয়েছে, তারই ফল এসব। স্রেফ উপাসনার দ্বারা এসবের কিছুই হয়নি। এ যাবত মানবসভ্যতার যা কিছু উন্নতি, তার সবই কর্ম, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের

ফল । বুদ্ধের নিজের জীবনও ছিল তাই । এ পথেই তিনি মানব-মুক্তির মহাসনদ খুঁজে পেয়েছেন । পৃথিবীতে প্রাণের চেয়ে দুর্লভ সম্পদ আর নেই—তাই প্রাণহননের বিরুদ্ধে কঠোরতম নিষেধ তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সর্বাত্মে । তিনি যে শুধু অহিংসা মন্ত্রই পৃথিবীকে শুনিয়েছেন তা নয়, সে সঙ্গে শুনিয়েছেন কর্ম উদ্যমের বাণীও । ধর্ম প্রবর্তকের মাধ্যমে সম্ভবত : একমাত্র তিনিই এমন দুঃসাহসিক কথা বলেছেন : Prayer is useless, for what is required is effort. The time spent on prayer is lost and the time spent on effort to achieve something is not lost. অর্থাৎ স্রেফ উপাসনায় যে সময় ব্যয় করা হয় তা নিষ্ফল কিন্তু কোন কিছু উপার্জনের প্রচেষ্টায় যে সময় ব্যয় করা হয় তাই ফলপ্রসূ ।

এ মহামানব সব রকম সংস্কারের বিরোধী ছিলেন । তাই মানুষের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহবান : দূর করো পুরানো সংস্কারকে, বরণ করে নাও নতুনকে, পরিহার করো পাপ, শ্রেয়কে করো সঞ্চয় । সব রকম পাপ আর বাসনা কামনার বিরুদ্ধে করো বীর বিক্রমে সংগ্রাম । বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধ সকলের দৃষ্টি, এ মহৎ বাণীর প্রতি আবার নতুন করে আকৃষ্ট হোক ।



মানবতন্ত্রী সাহিত্যিক আবুল ফজল সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য

জন্ম : কেউচিয়া, সাতকানিয়া, ১.৭.১৯০৩। সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ। ১৯১০-এ গ্রামের মক্তবে শিক্ষাজীবনের শুরু। ১৯১৪ থেকে ১৯২২ চট্টগ্রাম সরকারী নিউ স্কিম মাদ্রাসায় ; ১৯২৩-১৯২৪ ঢাকা আই. আই. কলেজে এবং ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং ১৯২৮-এ বি. এ., ১৯৩৮-এ এম. এ. পাশ [ক. বি.]।

১৯৩০-এ ঢাকা আই. আই কলেজে অস্থায়ী চাকরীতে যোগদান। ১৯৩২-এ কাজেম আলী স্কুলে সাময়িকভাবে শিক্ষকতা করার পর সীতাকুণ্ড নিউ স্কিম মাদ্রাসায় হেড মাস্টার। ১৯৩৩-এ খুলনা জেলা স্কুলে সরকারী চাকুরীতে যোগদান এবং ১৯৩৭-এ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে বদলী।

১৯৪১-এ কৃষ্ণনগর কলেজে এবং ১৯৪৩-এ চট্টগ্রাম কলেজে যোগদান। ১৯৫৯-এ চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৭৩-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পদে যোগদান এবং ১৯৭৭-এ পদত্যাগ। 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন, যার মূল কথা ছিল : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট-মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা'। ১৯৩১-'শিখা' সম্পাদনা।

১৯৬২-তে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬৬-তে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার ; ১৯৬৬-তে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ; ১৯৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট (সাহিত্যচার্য) অভিধা প্রদান; ১৯৮০-তে নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক; ১৯৮১-তে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার।

মৃত্যু : চট্টগ্রাম ৪. ৫. ১৯৮৩।

উপন্যাসগুলো হলো : চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০), সাহসিকা (১৯৪৬), জীবনপথের যাত্রী (১৯৪৮), রাজ্যপ্রভাত (১৯৫৭), পরাবর্তন (১৯৬৮)। গল্পগ্রন্থগুলো হলো : মাটির পৃথিবী (১৯৪০), আয়সা (১৯৫১), শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৬৪), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)।

প্রবন্ধগ্রন্থ : উপন্যাস-গল্প সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে ; বিচিত্র কথা (১৯৪০), বিদ্রোহী কবি নজরুল (১৯৪৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), সমকালীন চিন্তা (১৯৬৮), মানবতন্ত্র (১৯৭৩), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮), নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন (১৯৭৯), শেখ মুজিব, তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৫), মানবপত্র বুদ্ধ (১৯৭৯)। প্রবন্ধোপম দিনলিপি ; রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামাচা (১৯৬৯) দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)